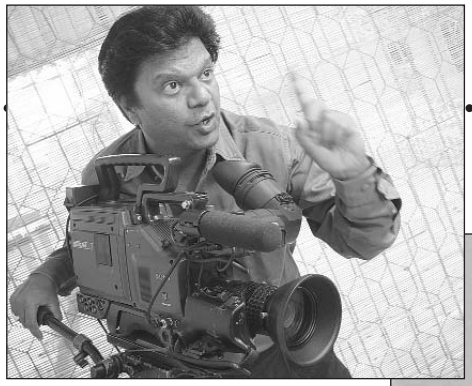

সেই রাতের কথা

কাওসার চৌধুরী অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। ২৫ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানি আর্মির গণহত্যা বিষয়ক একটা প্রামাণ্য চিত্র তিনি তৈরি করেছেন। ছবিটির নাম 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি'। বাংলাদেশের কোনো টেলিভিশন চ্যানেল তার ছবিটি দেখায়নি। কারণ পাকিস্তানি আর্মির গণহত্যা বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনাই ছবিটির প্রেক্ষাপট। বিভিন্ন অডিটোরিয়ামে দর্শকরা তার ছবি দেখেছেন, কেঁদেছেন, নির্মাতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ছবিটি বাংলাদেশী কোনো টিভিতে দেখানোর যোগ্যতা অর্জন না করলেও দক্ষিণ এশিয়া চলচ্চিত্র উৎসব থেকে পুরস্কার পেয়েছে। কেরালায় অন্য একটি উৎসবে কাওসার চৌধুরীর ছবি নিয়ে মাতামাতি করেছে। দেশ বিদেশে চলচ্চিত্রপ্রিয়দের প্রশংসা অর্জন করলেও বাংলাদেশ টেলিভিশন ছবিটি কেন দেখায় না বা দেখাইনি সেটা একটা গবেষণার বিষয়ই বটে। কাওসার চৌধুরী ছবিটি নিয়ে বিদেশে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেটাই সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন...

আমার অভিজ্ঞতা

গত মে মাসের শেষ দিকে যেতে হয়েছিল ভারতের কেরালায়। প্রামাণ্যচিত্র 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' নিয়ে 'আন্তর্জাতিক ভিডিও ফেস্টিভাল'-এ যোগ দিয়েছিলাম ওখানে। কোলকাতা থেকে প্রায় চার ঘন্টা উড়ে গিয়ে কেরালার রাজধানী ত্রিবিন্দ্রমে পৌঁছুতে হয়। ২৬ মে (সম্ভবত) বিকেলে রবীন্দ্র ভবন নামে এক মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হলো। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী উৎসবের উদ্বোধন করলেন। এখানেও চিরাচরিত নিয়মে কিছু বক্তৃতা, হাততালি এবং সবশেষে একটি কানাডীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উৎসবের উদ্বোধনী পর্ব শেষ হলো।

রাতে নৈশভোজের সময় আলাপ হলো পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউট আর্কাইভের প্রাক্তন কিউরেটর পি.কে. নায়ারের সঙ্গে। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক কিন্তু প্রচুর জানেন বোঝা যায়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বেশ আগ্রহী। শুনলাম, নায়ার বাবুকে কোনো এক সরকারের আমলে বাংলাদেশেও নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল আমাদের ফিল্ম আর্কাইভের একটি উন্নততর চিকিৎসা (!!) দেবার জন্য। কিন্তু ওই প্রেসক্রিপশন (!!) দেয়া পর্যন্তই সারা। ওষুধপথ্য (!!) কিছুই হয়নি, রোগও সারেনি। আমাদের আর্কাইভ তার আগের চেহারাতেই আছে, অনেক মূল্যবান ফিল্মের রিল এখনো ফ্লোরে

কাওসার চৌধুরী কি ভুল করলেন

__জাহিদ রেজা__ নূর প্রথম আলো পত্রিকার সাংবাদিক। তার পিতা শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন। যিনি ইত্তেফাক পত্রিকার তৎকালীন সময়ে নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাহিদ রেজা নূরের কাছে অত্যন্ত বেদনা আর গৌরবের। মুক্তিযুদ্ধে তিনি পিতাকে হারিয়েছেন। যিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশী জনগণের জীবনের সবচেয়ে আলোকিত আর উজ্জ্বল অধ্যায়। বাংলাদেশী জনগণের বীরত্ব আর বেদনার কাব্য। সুমহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আজ নানা কথা হয়। পাকিস্তানি জেনারেল মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানি জেনারেলদের বাড়াবাড়ি মনে করেন। এই অধ্যায় ভুলে যেতে পরামর্শ দেন। স্বাধীনতার বিরোধীরা গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগিয়ে ঘোরেন। স্বাধীন দেশের পুলিশ তাদের স্যালুট করে। জাহিদ রেজা নূর সাদাকে সাদা আর কালোকে কালোই বোঝেন। তিনি বোঝেন স্বাধীনতা বিরোধীরা সব সময় স্বাধীনতার বিপক্ষে। বাংলাদেশের বিপক্ষে। কাওসার চৌধুরী ২৫ মার্চের পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা নিয়ে ছবি নির্মাণ করেছেন। জাহিদ রেজা নূর তা দেখেছেন। কেঁদেছেন। দেশের আজ যে পরিস্থিতি রাজাকার-আলবদরদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসন দেখে তার মধ্যে অনেক প্রশ্ন জেগেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে এ দেশের রাজনীতিবিদরা অনেক দূরে। স্বাধীনতা বিরোধীরা স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে দম্ভ করে। আমরা তা দেখি। একজন শহীদের সন্তান, সচেতন নাগরিক, সাংবাদিক হিসেবে তিনি এগুলো মানতে পারেন না। তাই একজন __কাওসার চৌধুরী__ যখন সেই রাতের কথা বলতে আসেন তখন তিনি নির্বাক হয়ে পড়েন। ছবিটি দেখে __জাহিদ রেজা নূর__ প্রতিক্রিয়া লিখেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য...

১. শঙ্খ ঘোষে তো মিথ্যে নেই : লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে। কতো তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের অতীত ভুলে যাচ্ছি। কোনো কোনো বিজ্ঞজনও ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান দেখতে পান অতীতকে অগ্রাহ্য করার মধ্যে। অর্থাৎ এই আলোকিত ব্যক্তিরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে অতীত ভুলে গেলেই মোক্ষলাভ হবে।

২. ভালো কথা, আমরা না হয় অতীতকে ভুলে যাবো। গড়বো ভবিষ্যৎ। আমরা বিস্মৃত হবো, একাত্তরের নামে একটি আনন্দ-বেদনার কাব্য আমাদের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেছিল। অস্বীকার করবো ৭ মার্চের অস্তিত্ব। ভয়ার্ত হৃদয়ে সীমানা পেরুনো বাঙালিরাও ভুলে যাবে আত্মপরিচয়হীন জীবনে কতোটুকু অপমান লেখা থাকে।

৩. এটুকু ভুলতে পারলে কিংবা ভোলাতে পারলে কারো কারো সুবিধা হয়। তাহলেই সব কুছ ঠিক হ্যায়! তাহলেই বিজাতীয় সংস্কৃতিকে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে, গুবলেট পাকিয়ে আইয়ুব-মোনেম ভাই ভাই পরিচয়টাতে শাণ দেয়া যায়। এই প্রক্রিয়াতে রাষ্ট্রীয় ভাবনাও যে অগ্রসর হচ্ছে, তাও তো টের পাওয়া যায় পত্র-পত্রিকার দিকে নজর রাখলে, অন্তত পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের সময়কার।

৪. তবে এই অতি সরলীকরণের দিকে এগুনোর আগে আরেকটা সমীকরণের দিকে চোখ দেয়া যাক। এই দেশেই একদা জাহানারা ইমামসহ ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিককে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় আসামি করা হয়েছিল (খুব বেশি দিন আগে কি?)। সম্প্রতি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির বিশিষ্ট নেতা শাহরিয়ার কবিরকেও একই অভিযোগে জেলের ভাত খাওয়ানো হয়েছে। অতীত মনে রাখা না হলে এই মামলাগুলোতে কোনো পাপ নেই। হতেই তো পারে। যে দেশের কোনো অতীত নেই, সে দেশে মুক্তিযোদ্ধাই বা কি, যুদ্ধাপরাধী রাজাকারই বা কি? সুতরাং অতীত ইতিহাসহীন এ দেশে তেল-জলের এক দর। একাত্তরের ঘাতকদের বিচার চাওয়া সেদিক থেকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা তো হতেই পারে।

৫. তবে হ্যাঁ, অতীত ভুলে যাওয়া বলতে আমরা এ দেশের গণআন্দোলন ও স্বাধীনতাকে বোঝাবো। কিন্তু তার আগের পাকিস্তানি শাসন-শোষণের সময়টাকে দিল কা মোহাব্বত দিয়ে দেখতে হবে। এটা ভুললে চলবে না। ভুলতে হবে পাকিস্তানি বর্বরদের নৃশংসতার কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একদা তাদের সঙ্গে আমাদের ভাই ভাই সম্পর্ক ছিল।

৬. ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য, মানসিকতার পার্থক্যকে অস্বীকার করে শুধু ধর্মের সাযুজ্যই যে সম্পর্কের নিয়ামক শক্তি হতে পারে না, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তো পাকিস্তানের ইতিহাস। নাড়ির টান না থাকলে সংঘর্ষে ঘৃণাই বাড়ে শুধু। পারভেজ মোশাররফ একাত্তরে যে বাড়াবাড়ির কথা বলে গেলেন, সে বাড়াবাড়িটা আসলে কী ছিল? কতোটা হলে বাড়াবাড়ি হয়? তার মানে কি এই যে, ২০ লাখ মানুষ হত্যা করলে মাত্রাটা ঠিক ছিল, ৩০ লাখ হওয়ার কারণেই তা বাড়াবাড়ি হয়েছে? জেনারেল সাহেবই জানেন এর উত্তর। আর জানেন তারা, যারা জেনারেল সাহেবের বয়ানে ভক্তি গদগদ হয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চাইছেন অতীত ভুলে গিয়ে।

৭. কাওসার চৌধুরী বুদ্ধিমান লোক নন। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করার আগে কী করিলে কী হয় ধরনের একটি বই পড়া উচিত ছিল তার। তার উচিত ছিল জেনে নেয়া বাংলাদেশটা আদতে কোথায় যাচ্ছে। ২৫ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ঘটেছিল, তা মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরে তিনি কি ভালো করলেন? যখন অতীত ভুলে যাওয়ার জন্য সব ধরনের অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে, তখন আবার সেই পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে তুলে আমাদের করলেন রক্তাক্ত, আর অতীতহীনদের করলেন বিরক্তি উৎপাদন। না, কাওসার চৌধুরী ঠিক করেননি।

৮. শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে শুরুতেই ছবির পর্দায় দেখে আমার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। ঘুমন্ত কিংবা নিজের লাভালাভের হিসেবে ব্যস্ত থাকা হুজুগে বাঙালিকে তিনি সাহস করে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। বাঙালি

গড়াচ্ছে। যাই হোক।

উদ্বোধনীর পরের দিন দুপুর বেলা 'সেই রাতের কথা...' প্রদর্শনী। 'কো ব্যাংক ভবন অডিটরিয়ামে' চিত্রটি শুরুর আগে আমাকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ছবি সম্পর্কে ভূমিকা দিতে বলা হলো। আমি আবার ছবি শুরুর আগে 'লাইভ কমেন্ট্রি' দেবার পক্ষপাতি নই। কারণ, যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করার শুরুতে পরিচালককে ছবি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে দর্শকদের নাড়া দিতে হয়, সে চলচ্চিত্র না বানানোই ভালো বলে মনে করি। অবশ্য বিশেষ কোনো তথ্য যদি অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে মূল্যবান হয় এবং তা জানিয়ে দেয়াটা জরুরি, তাহলে ব্যাপারটা আলাদা। আমিও ওখানে সেটাই করলাম। একাত্তরের

সত্যি সত্যি তার অতীত ইতিহাস ভুলে যেতে বসেছিল। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের স্বকীয় পেটনীতি এবং সুশীল সমাজের সুশীল বয়ানে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ প্রতিরোধের ভাবনা থেকেই সরে গিয়েছিল দূরে। কিন্তু শহীদ জননী বুঝিয়ে দিলেন, অতীত ভুলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। সরলভাবে বোঝালেন, যে শয়তান, সে সবসময়ই শয়তান। রাষ্ট্র উল্টে গেলেই শয়তানের ফেরেশতা হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা যে সিসিফাসের মতো এখনও প্রতিদিন একই পাথর বারবার উঠাতে চাইছি পাহাড়ের চূড়োয়, তার কারণও আমাদের অতীত বিস্মৃতির মধ্যে নিহিত। যে জাতি জানে না তার করণীয় কী, সে তো লক্ষ্যবস্তুই চিনতে শেখেনি। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফাঁকেই নৃত্য শুরু হয়ে যায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা শয়তানদের।

৯. কাওসার চৌধুরী নিশ্চয়ই জানেন, ইদানীং সারা বিশ্বেই উগ্র ডানপন্থির উত্থান ঘটছে। কয়েক মাস আগে ফ্রান্সে ল পঁ-র উত্থান কি আমাদের শঙ্কিত করেনি? কিংবা ইটালিতে যে জোট সরকার ক্ষমতায় আছে, তাদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের আধিক্যই দেখা যায়। এ কারণেই এখন মুসোলিনির জন্মস্থান প্রেদাপ্পিওতে কালো পোশাকের কামানো মাথা নব্য ফ্যাসিস্টদের দেখা যাচ্ছে। সেখানে অবাধে বিক্রি হচ্ছে ফ্যাসিস্ট মনোগ্রাম, ব্যাজ, সিডিতে ফ্যাসিস্ট গান। ফ্যাসিজম আর নাৎসিজম যদি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, তাহলে আমাদের দেশেই বা আল-বদর, রাজাকারদের উত্থান ঘটবে না কেন? ফ্রান্সের জনগণ প্রথম রাউন্ডের নির্বাচনের পর ল পঁ-কে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে। ইটালি বরং ক্ষমতায়ই বসিয়ে দিয়েছে উগ্র ডানদের। ইটালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অপরাধীদের শাস্তি দেয়নি। তারা মিশে গিয়েছিল জনারণ্যে। এখন তারা মুসোলিনির মাহাত্ম্য কীর্তনের পর্যায়ে চলে এসেছে। বাংলাদেশের অবস্থাও কি এক নয়? তবে দু'দেশের জন্য সময়ের ব্যবধানটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার মতো।

১০. একাত্তরে তিনি ছিলেন রোকেয়া হলের কর্মচারী। লোকটির কথা বলার ধরন দেখে মনে হবে হয়তো রসিকতা করতে চাইছেন। বেশ তো এগুচ্ছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী একে একে শেষ করে দিল তার স্ত্রী, সন্তানদ্বয় ও ভাইকে। তাকে শুইয়েও রাখা হয়েছিল মৃত স্ত্রীর পাশে। এসব কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। মার্চ বা ডিসেম্বর এলেই একাত্তরের কাহিনী বর্ণনার জন্য উদগ্রীব হয়ে যান সংবাদপত্র বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার লোকেরা। এদের মধ্যে অনেকেই কাজ উৎরে দিতে পারলেই মনে করেন মোক্ষলাভ ঘটলো। কাজকে শুধুই কাজ ভাবলে তা হৃদয় স্পর্শ করে না। ভেবেছিলাম কাওসার চৌধুরীও সে রকম কিছু একটা নির্মাণ করেছেন। আমাদের 'ফালতু' আবেগে একটু নাড়া দিয়ে কলার নাড়ানোর দিকেই বুঝি ঝোঁক তার। কিন্তু রোকেয়া হলের সব হারানো মানুষটির হাসি হাসি মুখটা যখন সহসা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো, নেমে এলো সেকেন্ড কয়েকের নিস্তব্ধতা, তখন আমার মনে অতল গভীরে লুকিয়ে থাকা কষ্ট, হতাশা, অপমান যেন বের হয়ে পড়লো নিমিষের। আমারও গলায় কী যেন একটা আটকে গেলো। নীরবতার এই হৃদয় নিংড়ানো ভাষাই কাওসার চৌধুরীর 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' ছবিটিকে এক স্বর্গীয় বিভায় উদ্ভাসিত করলো।

১১. অতীত ভুলে যেতে বলার মানে কী? মানে কি এই যে, তোমাদের একটি অতীত আছে, সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া কোরো না? তাহলে তো অরুণ দে, রেণুবালা দেবী, মেঘনা গুহঠাকুরতা, ইদু মিয়াসহ অতীতের সাক্ষীদেরও নিকেশ করে দিতে হয়। ৩০ লাখ শহীদ কিংবা ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনের জীবিত আত্মীয়দের বলতে হবে : তোমরা শোনো, যা ঘটার তা তো ঘটে গেছেই। এখন অতীত ভুলে গিয়ে এসো আমরা বন্ধুত্ব করি। এই ভাবনা কেবল সেই মূর্খের পক্ষেই সম্ভব, যে স্বজন হারানোর ব্যথা কাকে বলে জানে না। যে বড় বড় তত্ত্ব কপচে বলতে পারে, ক্ষমা করে দেয়া মানবিক গুণ। ভেবেও দেখে না, যাদেরকে এই মানবিক গুণ প্রদর্শনের নসিহত করা হচ্ছে, তারা সে জন্য প্রস্তুত আছে কি না। ভাবখানা এমন, আমরা খুন, ধর্ষণ করে যাবো, মেয়েদের গণিমতের মাল বানাবো, দেশের সেরা সন্তানদের হত্যা করবো, তোমরা কিন্তু ভাই কিছু মনে কোরো না। তোমরা আমাদের ক্ষমা করে দিও কিংবা নিদেনপক্ষে অতীত ভুলে যেও। কাওসার চৌধুরীর প্রামাণ্যচিত্রটি এই অতীত ভুলনেওয়ালাদের গালের ওপর এক চোস্ত চপেটাঘাত।

১২. 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' ছবিটি বেশি করে দেখানো দরকার ঐ অতীত ভুলনেওয়ালাদেরই। ওদের বলা দরকার, তোমরা অতীতের স্পর্শ পাওনি বলেই নিশ্চিন্তে ক্ষমার মাহাত্ম-কীর্তন করতে পারছ। দেখ এই ছবিটি। দেখার পর যদি তোমাদের পাথর হয়ে যাওয়া হৃদয় নড়ে না ওঠে, একাত্তরের রক্তপাত যদি তোমাকে আপ্লুত না করে, তাহলে তুমি এ রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও এ দেশের নাগরিক নও। দেশের নাগরিক হতে হলে দেশের পানি, মাটি, বাতাস আর মানুষকে উপলব্ধি করতে হয়। সেটা তুমি করতে পারোনি। আর স্বজন হারানোদের বলব, তোমরা এই ছবি দেখে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ো না। বরং বরণ করে নাও সেই রাতের কথা বলতে এসেছির নির্মাতা ও তার সহযোগীদের, যারা প্রমাণ করেছে, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই মানুষের মহত্তম গুণ।

১৩. ছবিটি আত্মস্থ করার জন্য কাওসার চৌধুরী কিছু অংশের পুনর্নির্মাণ করেছেন। সেনাবাহিনীর একটি দলের সহযোগিতায় তিনি ২৫ মার্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বিশ্বাসযোগ্য করে। তবে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনার সময় কিছু অভিনয়ের অংশ রাখা যেতো। কোনো কোনো দৃশ্যকে পুনরাবৃত্তি মনে হয়েছে। কোন হলে কখন আক্রমণ হচ্ছে, সেটা টেলপে ব্যবহার করলে এই সমস্যা থাকতো না। ২৫ মার্চের পটভূমিতে প্রবেশের জন্য ৭ মার্চের সেই আগুনে-ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার সুপ্রযুক্ত। সেই সঙ্গে ইয়াহিয়ার কান্ড-কীর্তির বয়ান ২৫ মার্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ সুগম করেছে।

১৪. শহীদ মিনার থেকে শুরু হওয়া আলোর মিছিল শেষ হয় জগন্নাথ হলের গণকবরে এসে। এখন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম নেই, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনেও সেই বেগ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন থেকে একাত্তরকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া যাবে না। এই আলোর মিছিল থাকবে বহমান। কাওসার চৌধুরী সেই বহমানতাকেই সেলুলয়েডের মাধ্যমে উসকে দেয়ায় তাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকায় হত্যাযজ্ঞ চালাবার সময় মাঠ থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে তাদের হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যে তথ্য আদান-প্রদান করছিল তার বেশকিছু অংশ একজন বাঙালি প্রকৌশলী এম.এম. হুসেইন যাঁর নাম, উনি শর্টওয়েভে বিবিসি শুনতে গিয়ে তার রেডিওতে শুনতে পান এবং রেকর্ড করে ফেলেন। কয়েক বছর আগে ভদ্রলোক মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে তার এই মূল্যবান রেকর্ডগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দিয়ে যান। জাদুঘর থেকে সংগ্রহ করে তা থেকে আমি প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ 'সেই রাতের কথায়' ব্যবহার করেছি। শুধু এই তথ্যটা জানিয়ে দিয়ে এবং উৎসবের উদ্যোক্তা আর উপস্থিত দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়লাম।

ছবি শেষে তাৎক্ষণিক কিছু অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলো দর্শকদের কাছ থেকে। সবক'টি অনুভূতিই ইতিবাচক এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে। পরদিন দুপুরবেলা উৎসব এলাকায় সামিয়ানার নিচে শুরু হলো 'ওপেন ফোরাম।' আগের দিনে প্রদর্শিত ছবিগুলো নিয়ে দর্শক, সমালোচক এবং সাংবাদিকদের নিয়ে মুক্ত আলোচনাই প্রকৃতপক্ষে ওপেন ফোরামের উদ্দেশ্য। এই দিনের এই আলোচনায় কানাডা, গুজরাট এবং ত্রিবিন্দ্রমের নির্মাতার সঙ্গে আমাকেও বসতে হলো কাঠগড়ায়। নানা ছবি নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে শুরু হলো 'সেই রাতের কথা...' নিয়ে আলোচনা। সুধী পাঠক, এখানে নিজের ঢোল নিজেকেই পেটাতে হচ্ছে, উপায় নেই। আলোচনায় প্রধানত প্রশংসটাই বেশি ছিল। অবশ্য মাদ্রাজের একজন নির্মাতা রমনী মোহন, উনি প্রামাণ্যচিত্রটিতে সেনাবাহিনীর পুনরাভিনয়ের অংশটুকুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। আমি উত্তর দেবার আগেই পি.কে. নায়ার মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে সেনাবাহিনীর পুনরাভিনয়ের পক্ষে যুক্তি দিলেন। আমি হাঁফ ছাড়লাম। কিন্তু এর পর পরই বিপদ ঘটালো স্থানীয় এক সাংবাদিক। পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের বাংলাদেশ সফরের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, 'মি. চৌধুরী, পাক প্রেসিডেন্ট তো তোমাদের দেশ সফরের সময় উপদেশ দিয়েছেন একাত্তরের ব্যাপারটি ভুলে যাবার জন্য। তুমি তোমার চলচ্চিত্রে এ বিষয়টি নিয়ে এখনো নাড়াচাড়া করছো কেন? আমি বললাম, দেখ ভাই নাড়াচাড়ার ব্যাপার নয়। ২৫ মার্চের গণহত্যা, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথে বিশাল একটি কালো অধ্যায় এবং ইতিহাসের এই অংশটি নিয়ে আমি একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছি মাত্র। আশা করি বড় কোনো অন্যায় করিনি। ওই সাংবাদিক নাছোড়বান্দা। বললেন, 'ঠিক আছে উনি (জে. মো) তোমাদের একাত্তরের পুরো ব্যাপারটি ভুলে যেতে অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে তোমার ব্যক্তিগত অভিমত কি?' আমি বললাম, একাত্তরের এই গণহত্যায় যদি তোমার কোনো আত্মীয় কিংবা তোমার বাবা-মা মারা যেতেন তাহলে তোমার পক্ষে কি তা ভুলে যাওয়া সম্ভব হতো? এবারে সাংবাদিক সাহেব একটু নড়েচড়ে বসলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। বললেন, 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম তোমার যুক্তি। কিন্তু পাকিস্তান যদি একাত্তরের ঘটনার জন্য ক্ষমা চায়, তাহলে?'

আমি : পাকিস্তান এখনো তো তা চায় চায়নি।

সাংবাদিক : যদি কখনো চায়?

শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনের সন্তান জাহিদ রেজা নূরের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম, 'সে ক্ষেত্রে ক্ষমা হয়তো করতে পারি- কিন্তু ভুলতে পারবো না।'

পরদিন কেরালার কয়েকটা কাগজে দেখলাম ঠিক এই কথাটাকে ক্যাপশন করে আমার ছবি দিয়ে বক্স নিউজ করে বসেছে। 'দি হিন্দু' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকাতেও দেখা গেলো বেশ বড়সড় একটি নিউজ 'সেই রাতের কথা' নিয়ে। ও হ্যাঁ, একটা বেশ মজার ব্যাপার বলতে তো ভুলে গেছি। ওই দিন 'ওপেন ফোরামে' ভজঘট লাগিয়ে বসেছিল স্থানীয় এক চলচ্চিত্র কর্মী। বাইশ-তেইশ বছরের তরুণটি বলল, 'মি. কাওসার, তোমার প্রামাণ্যচিত্রটি এখানে আর দেখিও না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম- কেন?

তরুণ : প্রামাণ্যচিত্রটিতে পাকিস্তানি সৈনিকদের নিষ্ঠুর আচরণ দেখে আমি যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছি, তাতে অনুমান করতে পারি আমার মতো অনেকেই পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠবে এবং যেহেতু ছবিটি ভারতে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং দর্শকদের প্রায় সবাই ভারতীয়, সে ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শকরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। এমনিতেই যেখানে এ দুটি দেশে নিউক্লিয়ার টেস্ট নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে সেখানে তোমার এই ছবিটি দিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ লাগিয়ে দিও না।'

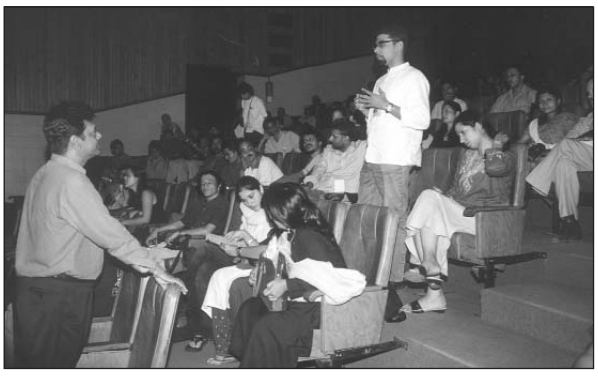

ওর কথা শুনে উপস্থিত সবাই দিলো হেসে। আমিও হাসতে হাসতে বললাম, দেখ আমার ছবিটির বিষয় এবং ক্যানভাস বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান, ভারত-পাকিস্তান নয়। তাছাড়া আমার ছবিটি তৈরি করেছি কারো বিরুদ্ধে কাউকে লেলিয়ে দেবার জন্যে নয়। এটি নির্মাণের পেছনে বিশেষ কোনো দুরভিসন্ধিও নেই। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের ছোট্ট একটি অংশ হিসেবে এই বিষয়টাকে বেছে নেয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যদি এখনো পৃথিবীর নানা দেশে হতে পারে, তাহলে একটি নির্জলা গণহত্যার বিচার চেয়ে এই ছবিতে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা কি খুব বড় অপরাধ করেছেন? এই সময় দর্শকদের মধ্য থেকে মাইক নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেশ বয়স্ক একজন ভদ্রলোক। নিজের পরিচয় দিলেন সাংবাদিক-সমালোচক বলে। বিগত প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ এ কাজ তিনি করে আসছেন বলে জানিয়ে বক্তব্য শুরু করলেন।

বললেন, 'মি. চৌধুরী, এই তরুণ চলচ্চিত্র কর্মীর মন্তব্যে তোমার মর্মাহত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ, তোমার চলচ্চিত্রটি যদি সত্যিই পাক-ভারত যুদ্ধ লাগিয়ে দিতে পারে তাহলে তোমার সত্যিই এই ভেবে গর্বিত হওয়া উচিত যে, তোমার ছবি উল্লেখিত দু'দেশের নিউক্লিয়ারের চাইতেও বেশি শক্তিশালী। আসলে তরুণ কর্মীটির মন্তব্যের আতিশয্যটুকু তার অস্থির তারুণ্য এবং অতি উর্বর মস্তিষ্কের ফসল।

ভদ্রলোকের কথায় উপস্থিত সবাই হাসাহাসি করে এক পর্যায়ে প্রসঙ্গের ইতি টানে।

পরদিন বিকেলে ভারতীয় চ্যানেল 'সুরিয়া' 'এশিয়া নেট' এবং স্থানীয় চ্যানেল 'কাইরালী' আমার সাক্ষাৎকারসহ ছবিটির অংশ বিশেষ প্রচার করেছিলো সেই সময়।

গত সেপ্টেম্বরে যেতে হয়েছিলো নেপালে অনুষ্ঠিত 'সাউথ এশিয়া ফিল্ম ফেস্টিভালে' অংশ নিতে। ওখানেও উৎসবের প্রথম দিন প্রদর্শিত হয় 'সেই রাতের কথা...'। ছবিটি শুরু হয় দুপুর

২টার দিকে। মিলনায়তনে ঢুকেই দেখি 'হাউজ' একদম 'ফুল'। অনেকে মিলনায়তনের ফ্লোরে সিঁড়িতে বসে পড়েছেন ছবি দেখতে। আমিও বসে পড়লাম তাদের পাশে। এখানে আর ছবির শুরুতে আমাকে ডাকা হলো না মঞ্চে। উৎসব পর্ষদের সভাপতি কনক দিক্ষীত দর্শকদের উদ্দেশে শুধু বললেন, ছবিটির প্রদর্শনী শেষে দর্শকরা নির্মাতার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবেন, নির্মাতা এখানেই উপস্থিত।

কনক দিক্ষীতের কথা শেষে মিলনায়তনের বাতি নিভে গেলো। শুরু হলো ছবি। আমার দৃষ্টি আর পর্দায় নেই। আমি দেখছি দর্শকদের চোখ-মুখ। পর্দায় একটু উজ্জ্বলতর দৃশ্য এলে দর্শকের মুখে সে আলোর প্রতিফলন পড়ে। ওই ফাঁকে দেখতে থাকি দর্শকদের প্রতিক্রিয়া। অনেক দর্শককে দেখলাম ছবির এক পর্যায়ে চোখ মুছছেন। তাতে একটু হাঁফ ছাড়লাম। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভিন্ন রাজনীতির কিছু মানুষকে 'সেই রাতের কথা...' টানতে পেরেছে দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম। তেতাল্লিশ মিনিটের মাথায় ছবি শেষ হলে আমাকে দর্শকের সামনে যেতে হলো। শুরু হলো দর্শকদের অভিমত, প্রতিক্রিয়া। প্রায় সবাই প্রামাণ্যচিত্রটির প্রশংসাই করলেন বলা চলে। তবে এখানে আমার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিলো দু'জন পাকিস্তানি চলচ্চিত্র নির্মাতার উপস্থিতি। একজন সামার মিনাল্লাহ, অপরজন শারমিন ওবায়েদ। দু'জনের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিলো একই উৎসবে। দর্শকদের মতামত এবং প্রশ্নোত্তরের এক পর্যায়ে পাক নির্মাতা সামার মিনাল্লাহকে অনুরোধ করলাম তার অনুভূতি জানাবার জন্য। সামার বললেন, 'আমি তোমাদের লোকজনের (সাক্ষাৎকার প্রদানকারী) মতামতের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি।... তোমার ছবির নির্মাণ ভালো এবং তোমাকে অভিনন্দন।' বোঝা গেল বেশ ডিপ্লোম্যাটিক ইনি। সহজে মুখ খুলবেন না। অপর পাক নির্মাতা শারমিন ওবায়েদকে ধরলাম তার অনুভূতির জন্য। শারমিন বললেন, 'মি. চৌধুরী, আমি তোমার ছবি দেখে আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।' শুনে আমি তো মহা আপ্লুত। 'সেই রাতের কথা...' একজন পাকিস্তানিকেও আবেগাপ্লুত করেছে, এটা আমার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু না, পরক্ষণেই শারমিন জানালেন, 'আমার চোখে পানি এসেছে এই কারণে যে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমাদের পাকিস্তানি সৈন্যরা তোমাদের দেশে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করেছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তুমি কি বলতে চাও যে, আমরা এই ইতিহাস আমাদের মনের মতো করে তৈরি করেছি? শারমিন বললেন, 'তা বলছি না, কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী পৃথিবীর নামকরা একটা বাহিনী। এমন এক বাহিনী এমনটা করেছে, আমার বিশ্বাস হয় না।' অনূর্ধ্ব তিরিশ বয়েসী এই নির্মাতাকে বললাম, দেখ শারমিন, তোমার জন্ম তো একাত্তরের পরে, ফলে তোমার পক্ষে ধারণা করা কঠিন তখনকার নৃশংস হত্যাকান্ডগুলো সম্পর্কে। আমাদের দেশে আমাদের নতুন প্রজন্মের অবস্থাও অবশ্য তোমার মতো একই অবস্থা প্রায়। তারচেয়ে এটা বরং ভালো, তুমি যদি তোমার পিতাকে একাত্তর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, তিনি হয়তো তোমাকে একাত্তরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানাতে পারেন। অবশ্য তার দৃষ্টিভঙ্গি যদি নিরপেক্ষ হয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ নিতান্তই ভালো। এবং তাদেরকে পাকিস্তানের তদানীন্তন সরকার বাংলাদেশে তারা (সরকার) কি ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত করেনি। বরং উল্টোটাই বুঝিয়েছে। দেখ শারমিন, আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমার প্রামাণ্যচিত্র কিছুতেই পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়। আমার ছবিতে যে ভুক্তভোগীরা কথা বলেছেন, তাদের সঙ্গে আমিও

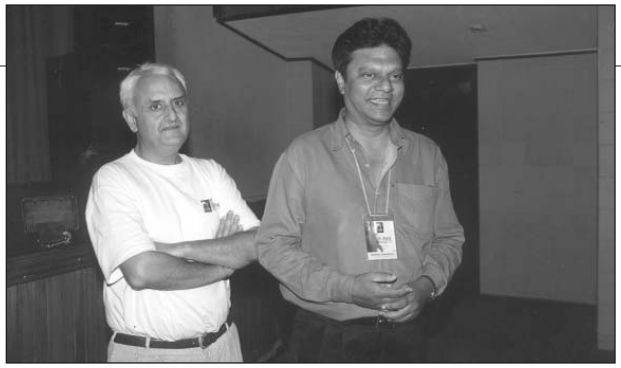

উৎসব চেয়ারম্যান কনক দিক্ষীতের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের সময়

পুরস্কার প্রাপ্তির পর অনুভূতি প্রকাশ

একমত যে, একাত্তরের সম্পূর্ণ হত্যাকান্ডের জন্য পাকিস্তানের গুটিকয়েক বর্বর জেনারেল এবং কয়েকজন ধড়িবাজ রাজনীতিবিদই দায়ী। তবে পাশাপাশি আমি এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, আমার ছবি এবং আমি নিজে সব গণহত্যা, সব সন্ত্রাস, সব আগ্রাসন, সব মৌলবাদ এবং সব ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সারা জীবনই সোচ্চার থাকবো।

শারমিনের প্রসঙ্গটা শেষ হতেই একজন নেপালি সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'মি. চৌধুরী, তুমি তোমার ছবিতে দু-দু'বার শেখ মুজিবকে দেখিয়েছো, এটা কি খুব বেশি প্রয়োজন ছিল? আমার মনে হয় তুমি আওয়ামী লীগের প্রতি একটু দুর্বল।'

উত্তরে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম, দেখ ভাই, তিব্বতের লুসাই পাহাড় থেকে একটা নদীর উৎপত্তি হয়ে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তা এসে প্রবেশ করেছে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামকে দু'ভাগ করে ওই নদীটা কর্ণফুলী নাম নিয়ে গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। আমি ইচ্ছে করলেই যেমন খরস্রোতা এই নদীর গতিপথ এবং বহমানার ইতিহাস পরিবর্তন করে দিতে পারি না, ঠিক তেমনিভাবে পারি না বাংলাদেশের ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করতে, অবশ্য এটা উচিতও নয়, আমাকে দিয়ে সেটা সম্ভবও নয়। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর আটচল্লিশ, বাহান্ন, চুয়ান্ন, ষাট, বাষট্টি, ছেষট্টি, ঊনসত্তর এবং সত্তর হয়ে একাত্তরে এসে অর্জিত হয় বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা, তা কিন্তু ওই নদীর মতোই প্রবাহিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের ওপর দিয়ে। এই প্রামাণ্যচিত্রে আমি তো ইতিহাস বিকৃত করিনি। আর পঁচিশে মার্চের ঘটনাটা তো কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, এটা একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারই ফল মাত্র। সাতচল্লিশ -রবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে, বিশেষত ছয় দফা প্রণয়ন এবং তৎপরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের মূল নায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ফলে তাঁর কথা তো আসবেই। আমার উত্তরে সাংবাদিক বন্ধুটি নিবৃত হলেন।

আটাশে সেপ্টেম্বর ছিল নেপালে উৎসবের শেষ দিন। এই দিনই পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সকালের নাস্তা সেরেই দৌড়ালাম রাশান কালচারাল সেন্টারে, যেখানে উৎসবের ছবিগুলো প্রদর্শিত হচ্ছিল। কিন্তু গিয়েই দেখি সব জায়গায় কেমন জানি বিদায়ের সুর। চলচ্চিত্র কর্মী এবং আয়োজকদের প্রায় সবাইকে বেশ ক্লান্ত দেখালো। কিন্তু দু'জন মানুষের মধ্যে কোনো ক্লান্তি নেই। এক. উৎসব পরিচালক মানেশ শ্রেষ্ঠ, দুই. অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী রেসু এরিয়েল। এ দু'জনের প্রাণশক্তির প্রশংসা করতে হয়।

বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম কাঠমন্ডুর একটা অভিজাত সিনেমা হলে যেখানে উৎসবের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ভেতরে আমাদের জন্য নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসলাম। বুকের ভেতরে একটু কেমন যেন অনুভূতি।

উৎসব পরিচালক মানেশ শ্রেষ্ঠ মঞ্চে গিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করছেন। পাশে জুরিবোর্ডের চেয়ারম্যান মার্ক টালী এবং অন্যান্যরা। প্রথমেই পঞ্চম পুরস্কার 'জুরি মেনশন'। এটা গেল নেপালে। তারপরে চতুর্থ সম্মাননা। ভাবলাম এটা পেলেও মন্দ হয় না। কিন্তু কপাল মন্দ, এটা গেল ভারতের বিহার রাজ্যে। এবারে মূল পুরস্কার ঘোষণা।

তৃতীয় পুরস্কার ঘোষিত হল, আমার ভাগ্যে জুটল না। আমি আশা ছেড়ে দিলাম। এবার ঘোষিত হল Second best award goes to Bangladesh for 'Shei Rater kotha Bolte Eshechi.' I request Mr. Kawsar Chowdhury, director of this film to receive the award from... ইত্যাদি। মনটা লাফিয়ে উঠল কয়েকটি কারণে। প্রথমত, পুরস্কার পেলে কার না ভালো লাগে, আমিও আপ্লুত অবশ্যই। পাশাপাশি পুরস্কার ঘোষণার ধরনটি আমাকে উদ্বেলিত করল। সুধী পাঠক, একটু লক্ষ্য করুন, ঘোষণার প্রথম বাক্যটি হচ্ছে Second best award goes to Bangladesh. এখানে পরিচালক কিংবা ছবির নামটি প্রধান নয়, প্রথমেই উচ্চারিত হল আমার দেশের নাম। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, দেশের জন্যে গর্বে বুকটা ভরে গিয়েছিল।

মাইক্রোফোন দেয়া হল আমার হাতে। তাৎক্ষণিক অনুভূতি জানাবার জন্যে। মাইক হাতে নিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল রেনু বালা দে'র কথা। যিনি একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতে স্বামী-সন্তান হারিয়ে নিস্ব হয়েছেন। একে একে মনে পড়ল মোহন রায়, হরিধন দাশ, ইদু মিঞা, শ্যামলাল, মেঘনা গুহ ঠাকুরতাসহ শহীদ প্রফেসর মুনিরুজ্জামানের সন্তানের কথা। যারা এই রাতে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হারিয়েছেন। মনে পড়ল নয় মাস যুদ্ধে শহীদ তিরিশ লাখ বাঙালির কথা। পাশাপাশি ষোলই ডিসেম্বরে আমাদের বিজয়ের কথা। এ এক মিশ্র অনুভূতি। আনন্দ-বেদনার মিশ্র অনুরণন। তবে হ্যাঁ, আমার প্রয়াত বাবা-মায়ের মুখ দু'টোও কিছুক্ষণের জন্য ভেসে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। সেই বাহাত্তরে বাবা আর চুয়াত্তরে মা মারা গেছেন। আজ বেঁচে থাকলে পুত্রের এই আনন্দের সময়টাতে ভীষণ খুশি হতেন। মাঝে মাঝে একজন মায়ের জন্য ভীষণ তৃষ্ণা জাগে। না পারি কাউকে বলতে, না পারি তেমন একজন কাউকে পেয়ে যেতে যিনি একজন সত্যিকারের মায়ের স্নেহ দিতে পারেন। এ এক অদ্ভুত যাতনা। যাই হোক, পুরস্কার নিয়ে দেশে ফেরার পর অনেকের কাছ থেকে অনেক অভিনন্দন পেয়েছি। তবে আমি মনে করি যেহেতু চলচ্চিত্র হচ্ছে একটি যৌথ শিল্প, সেহেতু এই অর্জন আমার প্রতিটি সহকর্মীর, যারা রাতদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে এই প্রামাণ্যচিত্রটিকে সফলতার দিকে নিয়ে গেছেন। তারা প্রত্যেকেই এই পুরস্কারের অংশীদার।

এখানে একটি ব্যাপারে একটু উল্লেখ করতে চাই। আমার কাছে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের দু'টি রূপ। এক. অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা এবং বিশাল এক হারানোর শোক। দুই. সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বীরত্বের সঙ্গে বিজয় অর্জন। শুধুমাত্র এই দু'টি বিষয় নিয়েই যদি জনাবিশেক চলচ্চিত্র নির্মাতা বিশ বছর কাজ করেন, তাহলেও বোধ হয় মুক্তিযুদ্ধের সব 'ডিটেল' পাওয়া সম্ভব নয়। তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা অনেক ঘটনা, অনেক ইতিহাস এখনো অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। তবে আমার ইচ্ছে আছে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের বীরত্ব নিয়ে একটি ছবি করার। সুধী পাঠক, ছবি করার উপযোগী কোনো বীরত্বের কাহিনী যদি জানা থাকে আপনাদের, আর সেটা যদি সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঠিকানায় লিখে পাঠান তাহলে আমি উপকৃত হবো।

সবশেষে শহীদ সিরাজউদ্দিন হোসেনের সন্তান জাহিদ রেজা নূরের ৭ নম্বর প্রসঙ্গটি নিয়ে বলছি। না ভাই, আমি আসলেই বুদ্ধিমান নই। বুদ্ধিমান হলে তো প্রামাণ্যচিত্র না বানিয়ে ভালো আয় রোজগার হয় এমন কাজ করতাম, বাল-বাচ্চা নিয়ে সুখী হতাম। কিন্তু জীবনের এতগুলো বছর যেহেতু ভুল করেছি, ভুল পথে চলেছি, বাকি বছরগুলোতে আর তা শোধরাতে চাই না। যতদিন আছি, আপনার কথিত ভুলটি করে যেতে চাই, দোয়া করবেন।